



আমাদের চোখে
মাকড়শা জাল বোনে

খান মুহাম্মদ রুমেল
আমাদের চোখে
মাকড়শা জাল বোনে



অনিন্দ্য প্রকাশ

দ্বিতীয় মুদ্রণ
মাঘ ১৪৩০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪৩০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ০২২২৬৬৩৭৯৯৬, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
৪০/১, মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১৩৬২
মোবাইল : ০১৯১৯৬৬৪৯৭০
বানান সমন্বয়ক
প্রণব রায়
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ : প্রণব এষ
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১-ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
মূল্য : ৩০০.০০ টাকা

Amader Cokhe Makarasa Jal Bone by Khan Muhammad Rumel

Published by Md. Afzal Hossain

Anindya Prokash

38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 02226637996, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com

2nd Print : February 2024

Price : 300.00

US \$ 10

ISBN 978 984 98362 4 7

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন

www.anindyaprokash.com ফোনে অর্ডার করতে ০১৫৭১১৯৬৬৬
www.rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
www.othoba.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
www.boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
www.boiferry.com/publisher/anindya-prokash/ ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬৩৮১১২১১২
www.prothoma.com/anindyaprokash/অনিন্দ্য-প্রকাশ ফোনে অর্ডার করতে ০১৯৮৮৩৩৭৭৩৩

উৎসর্গ

রেজানুর রহমান

অনেক বছর আগে এক শীতের দুপুরে তার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম,
পায়ের তলায় নরম মাটি নিয়ে। চলার পথে শক্ত মাটি এবং মসৃণ পথ
দেয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি। এখনো তার প্রশ্নে আছি।

তাকে দেখব বলে চাতক হই না ।
তৃষ্ণা যদি বাড়ে?
তারচেয়ে বরং,
নির্লিপ্ত হয়ে যাই ।
কষ্ট গিলে বসে থাকি
নীলকণ্ঠ আমি!

ভূমিকা

খুব ছোটবেলায় একবার শীতলক্ষ্যা পার হচ্ছি ইঞ্জিনের নৌকায়। বাবা মা'র সঙ্গে। চোখে পড়ে নদীর কিনার ধরে লম্বা একটা দড়ি ধরে দৌড়াচ্ছেন একজন মানুষ। কিছুক্ষণ পর চোখে পড়ে আরো কয়েকজনকে। বাবার কাছে জানতে চাই— এই লোকগুলো কারা? দড়ি ধরে দৌড়াচ্ছেন কেন? বাবা জানর, এঁরা সবাই দড়ি ধরে নৌকা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। দড়ি ধরে এভাবে নৌকা টানাকে বলে গুণটানা। পাড়ের থেকে নদীর পেটে তাকিয়ে দেখি— আসলে প্রতিটি দড়ি বাঁধা আছে একটা করে নৌকার সঙ্গে। সেই গুণটানাদের নিয়ে একটা গল্প লিখেছিলাম। আরো অনেক কিছুর মতো সেই লেখাও হারিয়ে গেছে কোথায় যেন। তবে নোনাধরা শৈশব স্মৃতির মতো লেখাটার কথা প্রায়ই মনেপড়ে। সেটিই ছিলো আমার লেখা প্রথম গল্প?

গল্প লিখি অনেক দিন ধরেই। এরই মধ্যে প্রকাশ হয়েছে বেশকিছু গল্পবই। এই বই সেই ধারায় আরো একটি চেষ্টা। মানুষের আনন্দ বেদনা মিলন বিরহ সংকটের কথা বলার চেষ্টা করেছি গল্পে গল্পে।

প্রিয় পাঠক শুভেচ্ছা নেবেন। কল্যাণ হোক সবার।

আনন্দে পড়ুন।

খান মুহাম্মদ রুমেল

হাতিরপুল, ঢাকা।

khanmuhammadrumel@gmail.com

সূচি

সেদিন শুক্রবার ছিল	১১
সাদা রং আড়াইতলা	২০
রোদ দুপুরে	৩০
বারুদ গন্ধে ফুলের মায়া	৩৮
আমাদের একলা রাত	৫২
আমার দেওয়া তোমার নাম	৬২
স্মৃতিগন্ধ	৭০
সুমিত্রার নাম তারাবানু	৭৯
গল্পটি হয়তো আমি লিখতে পারি না	৯৩
আমাদের চোখে মাকড়শা জাল বোনে	১০১
স্বপ্ন দেখি গল্পটা বলব বলে	১১১
জলের জীবন	১২১

সেদিন শুক্রবার ছিল

সন্ধ্যায় জানতে চেয়েছিলে এখানে শীত কেমন? বলেছিলাম ঢাকার মতোই অনেকটা। কিন্তু এখন প্রায় মাঝরাতে জেঁকে বসেছে শীত। খোলা জানালা দিয়ে হু হু করে বাতাস আসছিল। মাত্র বন্ধ করে দিলাম জানালাটা। এখন কম্বল মুড়ি দিয়ে আরামদায়ক উষ্ণতার ভেতর আছি। অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করছিলাম একটা সুন্দর কবিতা লেখার। পড়ে যেন মনের অজান্তেই তুমি বলে ওঠো— বাহ! কিন্তু আমি পারিনি রাই। কোনো ছন্দিত শব্দ ধরা দেয়নি মগজে। আমি খুব করে জানি, ইদানীং কবিতার নামে যেসব ছাইপাশ লিখছি, সেগুলো তোমাকে মুগ্ধ করেছে না মোটেই। বরং বিরক্তি তৈরি করে থাকতে পারে তোমার মনে। আদতে কবিত্বের যন্ত্রণা অনেক বেশি। কবি জীবন মানে নিস্তারহীন দহন যাত্রা। জানো রাই— একবার এক ইন্টারভিউতে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল— কেন লিখেন আপনি? উত্তরে হরবর অনেক কথা বলেছিলাম। তবে মনে মনে বলেছিলাম— রাইকে মুগ্ধ করার জন্য লিখি!

বলছিলাম, শীতের জন্য একটু আগে জানালা বন্ধ করে দিয়েছি। তুমি কি জানো রাই, ছোটবেলায় এই ঘরে আমি একা থাকতাম। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা— সব সময় জানালা খোলা রেখে ঘুমাতাম। এমন কতো হয়েছে— গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে অসম্ভব ভয় পেয়েছি। তারপরও জানালা বন্ধ করার কথা ভাবিনি। আবার এমনও হয়েছে— হঠাৎ শেষ রাতের জোছনা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। বললে তুমি বিশ্বাস করবে কি না জানি না, শেষ রাতের দিকে জোছনার আলোয় মুগ্ধ হয়ে কতোদিন ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেছি! ভেবেছি একটু পরেই ভোরের আলো আসবে। কিন্তু অনেক হাঁটাহাঁটির পরেও সূর্যের দেখা না পেয়ে আবার ঘরে এসে ঘুমিয়ে পড়তাম। তখন আমি মাত্র ক্লাস এইট পড়ুয়া। নিতান্তই বালক ছেলে। আমাদের বাড়ির সামনে বিশাল এক মাঠ। বিস্তৃত ফসলের জমি। দেখতাম জোছনায় ভেসে যাচ্ছে ফসলের খেত। চারদিক যেন দিনের আলোর মতো ধবধবে সাদা। আর কী ভীষণ বাতাস বইতো তখন!

আমার পাশের রুমে দাদাজান ঘুমাতেন। রাতবিরেতে ছটছাট আমার ঘর ছেড়ে বের হয়ে যাওয়া দেখে মাকে ডেকে দাদাজান বলেছিলেন—

পাভেলকে একটা তাবিজ এনে দাও বউ মা! ওর মনে হয় খারাপ কিছুর
আছর লেগেছে!

আহা আমার দাদাজান। কতোদিন পর তার কথা মনে পড়লো! আমার
দাদাজান ছিলেন রহস্যময় এক মানুষ। বিরাট পরহেজগার। মাগরিবের
নামাজ শেষে তসবি জপতে বসতেন। একেবারে এশা পর্যন্ত টানা তসবি
জপে যেতেন। ভোরে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ে আবার চলতো দোয়া দরুদ
পড়া। ফজর শেষ করে হাঁটতে বের হতেন। অনেক সময় আমি দাদাজানের
হাঁটার সঙ্গী হতাম। তিনি কিন্তু আমার আপন দাদা ছিলেন না। আমার
দাদার ছোটো ভাই। চিরকুমার ছিলেন। আমাদের সঙ্গেই থাকতেন। ছিলেন
আমৃত্যু। আমরা ডাকতাম মিয়াদাদা বলে। তখন আমি ছিলাম হুমাযুন্
আহমেদের বইয়ের পোকা। সারাক্ষণ তার বই নিয়ে পড়ে থাকতাম।
মিয়াদাদা বলতেন, হুমাযুনের বই পড়ে কী হবে? শরৎ পড়ো, বন্ধিম পড়ো।
সকালে হাঁটতে হাঁটতে অনর্গল বলে যেতেন শরৎচন্দ্রের লেখা বইয়ের
লাইন। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। বন্ধিম চন্দ্রের কুপালকুণ্ডলার রোহিনীর কথা
আমি মিয়াদাদার কাছ থেকেই জেনেছি। তিনি আমাকে আ ন ম বজলুর
রশীদের বই পড়তে বলতেন। তার মুখেই আমি প্রথম কাজী ইমদাদুল
হকের কথা শুনি। পরে নবম শ্রেণিতে ওঠার পর কাজী ইমদাদুল হকের
বিখ্যাত বই— আব্দুল্লাহ আমাদের সহপাঠ্য বই হিসেবে পেয়েছিলাম। আহা,
আমার মিয়াদাদা! এমন এক শীতের সন্ধ্যায় তিনি আমাদের ছেড়ে চলে
যান। সেদিন ছিল ফেব্রুয়ারির চার তারিখ। আমি তখন কলেজে পড়ি।
মিয়াদাদা অসুস্থ— কলেজ হোস্টেল থেকে এমন খবর পেয়ে বাড়ি পৌঁছে
দেখি তিনি আর নেই।

রাই,

জানি না তোমাকে এতো কথা কেন বলছি। হয়তো বিরক্ত হচ্ছে।
হয়তো বোর লাগছে আমার কথা শুনে। তবুও আজ অনেক কথা বলতে ইচ্ছে
করছে তোমাকে। জানো তো, ছোটোবেলা থেকেই আমার হোস্টেল জীবন।
ক্লাস নাইনে থাকতে উঠে গেলাম হোস্টেলে। তারপর কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়
সব বাড়ির বাইরে বাইরে। স্কুলে থাকতে কতো যে হোস্টেল ছেড়ে
পালিয়েছি! আমাকে স্কুল হোস্টেলে রেখে বাবা বাড়িতে আসার আগেই আমি
বাড়ি এসে বসে থেকেছি। স্কুল ফাইনালের আগে আগে একবার হোস্টেল
ছেড়ে পালালাম। গিয়ে উঠলাম এক বন্ধুর বাসায়। সেখানে একরাত থেকে
ভোরবেলা বের হয়ে যাই। বাড়ির পাশের বড়ো রাস্তায় ব্রিজের ওপর বসে
থাকি সারাটা সকাল। কে যেন বাড়িতে গিয়ে খবর দেয়। মিয়াদাদা এসে
আমাকে বাড়ি নিয়ে যান। সেদিন দাদাজান ভীষণ মন খারাপ করেছিলেন।

নিজে নিজেই বলছিলেন- ছেলেটা কি তবে পরীক্ষা দেবে না? পড়াশোনা না করলে খাবে কী করে? সেদিন বিকেল বেলা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ কান্নার শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে যায়। কিছুটা ধাতস্ত হয়ে বুঝতে পারি- আসর নামাজ শেষ করে মিয়াদাদা মোনাজাত করছেন। আল্লাহর দরবারে হাত তুলে আমার জন্য দোয়া করছেন। আর অঝোরে কাঁদছেন। চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে তার শুভ্র সাদা দাড়ি। ভিজ়ে গেছে পরনের পাঞ্জাবি। এই দৃশ্য দেখে খুব মন কেমন করতে থাকে আমার। এরপর আমি আর হোস্টেল পালাইনি। এসএসসির রেজাল্ট খুব ভালো হয়েছিল আমার। দাদাজান যে কী খুশি হয়েছিলেন- বলে বোঝাতে পারবো না রাই।

একবার কী হয়েছিল জানো? আগেই বলেছি, আমাদের বাড়ির সামনে বিস্তীর্ণ ফসলি জমি। এক মাথা থেকে আরেক মাথা দেখা যায় না এতো বড়ো মাঠ। আমরা গ্রামের মানুষেরা বলি মাঠের বন্দ। বর্ষাকালে সেই মাঠের বন্দ পানিতে ভরে যায়। বিপুল জলরাশিতে হাওড়ের রূপ নেয় মাঠ। বড়ো বড়ো ঢেউ দেখে মনে হয় বিশাল দরিয়া। সেই নতুন বর্ষা জলের পানিতে ছেলেমেয়েরা দলবেঁধে সাঁতার কাটে। কলার ভেলায় করে শাপলা শালুক তুলে বেড়ায়। মাঠের বন্দে বর্ষা পানি এলেই আমার চাচাতো ভাইয়েরা দলবেঁধে লেগে যায় কলার ভেলা বানাতে। ইয়া বড়ো বড়ো কলাগাছ কেটে জড়ো করে বাড়ির বাইরের উঠোনে। তারপর খেত থেকে কাঁচা পাট তুলে এনে তাই দিয়ে দড়ি বানানো হয়। তিন চারটা কলাগাছ একসঙ্গে করে তার ভেতরে বিশেষ কায়দায় মোটা বাঁশের কঞ্চি ঢুকিয়ে তারপর দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে বানানো হয় ভেলা। আমিও ভিড়ে যাই সেই দলে। কিন্তু মায়ের কড়া নিষেধ পানিতে নামা নিয়ে। আমি যে তখন সাঁতার জানি না। এক বর্ষায় সবার অলখে আমি নেমে গিয়েছিলাম মাঠের বন্দে। ভাবনা ছিল কিনারের হাঁটুজলে একটুক্ষণ থেকে উঠে আসবো। কিন্তু পানিতে নামার পর বিশাল ঢেউ আমাকে টেনে নিয়ে যায় অথই জলে। আমি হাবুডুবু খেতে থাকি। আমি ডুবতে থাকি। আমি ভাসতে থাকি। আমার মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের হয় না। আমার প্রবল জোরে চিৎকার করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কোনো কথা বলতে পারি না আমি। আমার পেটে পানি ঢুকে যেতে থাকে। আমি নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে থাকি। ঠিক তখন কোথেকে জানি হাজির হন মিয়াদাদা। কাঠের খড়ম পায়ে দিতেন তিনি। সেই খড়ম পায়ে তিনি নেমে পড়েন পানিতে। ঐটেল মাটির কাদায় আটকে যায় কাঠের খড়ম। তারপরেও আছাড়ি পিছাড়ি করে কোনোমতে আমার কাছে পৌঁছান তিনি। আমাকে বুকুর মধ্যে জড়িয়ে ধরে বুক সমান পানিতে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি। তখন আমার বয়স কতো? ছয় কি সাত।

বেশ নাদুসনুদুস ছিলাম। সেই বৃদ্ধ বয়সে আমাকে কোলে নিয়ে পানি থেকে ডাঙায় তুলে আনার মতো শক্তি তার শরীরে ছিল না। পরে কীভাবে সেখান থেকে আমরা দাদা নাতি উদ্ধার পেয়েছিলাম সে গল্প না হয় আরেক দিন করবো। সেই ঘটনার অনেক বছর পর মিয়াদাদাকে আমি বলেছিলাম— আপনি তো আমার জীবনদাতা। শুনে দাদা বলেছিলেন— তওবা কর। এখনই তওবা কর। জীবনদাতা একমাত্র আল্লাহ। আমি শুধু উসিলা মাত্র।

এখানে এই গ্রামে, আজকেই আমার শেষ রাত। ভোর সকালে গাড়ি আসবে। আবার শুরু হবে ভীষণ কর্মব্যস্ত গতির জীবন। বিশ্বাস করো রাই— আমি এতো গতি খ্যাতি যশ কিছুই চাইনি। আমি শুধু চেয়েছিলাম এই শান্ত জনপদে একটা নিরাপদ শান্তির জীবন।

সব মিলিয়ে তোমাকে একান্তে কতোদিন পেয়েছি বলো তো? মাত্র একদিন। অথবা ঠিকঠাক করে বলে দেড় দিন! অথচ সারাক্ষণ তুমি চোখের সামনেই থাকো। যেই বিকেলে তোমাকে আধঘণ্টা কি পৌনে একঘণ্টার মতো একা পেয়েছিলাম, তার প্রতিটি মুহূর্ত আমার মনে আছে। এমনকি সেদিন তুমি কি রঙের জামা পরেছিলে, সেটাও মনে আছে। তোমার হাতে ছিল রূপালি চেইনের ছোট্ট একটা ঘড়ি। তাও মনে আছে আমার। এছাড়া মেলায় কাটানো সেই আধখানা বিকেল— সেটাও মনের মাঝে রেখে দিয়েছি সযতনে। জানি তোমার কাছে ওসবের কোনো মূল্য নেই। কিন্তু দুটো বিকেলকেই আমি মূল্যবান মণিমুক্তোর মতো হৃদয়ে রেখে দিয়েছি।

আমার কথাগুলো নিশ্চয় খুব এলোমেলো লাগছে তোমার কাছে। লাগারই কথা। কোথাকার কথা কোথায় নিয়ে যাচ্ছি। কথার খেই হারিয়ে ফেলছি।

আচ্ছা সেদিনের কথা একটু বলি। ওইদিন যখন তোমাকে দূর থেকে দেখি— আমি ভেবেছিলাম তুমি কাছে আসবে। পরে যখন একটা মিষ্টি হাসি দিয়ে চলে গেলে, তখন মনে হলো আমার আরো অনেক চাওয়ার মতো এটাও অপূর্ণ থেকে যাবে। কিন্তু না, ঘণ্টাখানেক বাদে তুমি আবার এলে। আমরা দাঁড়িয়ে গল্প করলাম কিছুটা সময়। কফি খেলাম। এরপরই যথারীতি চলে যাওয়ার তাড়া দেখাতে শুরু করলে তুমি, যেমনটা সবসময় দেখাও। তারপর আমার অনেক অনুরোধে কিছুটা সময় থাকলে। তুমি কি জানো, আমি নিজের জন্য কখনো কাউকে অনুরোধ করি না। শুধু তোমাকে কেন যেন করি। সেদিন সেই বিকেলে, তোমার হাত ধরতে খুব ইচ্ছে করছিল। চেষ্টাও করেছিলাম। কিন্তু তোমার কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে খারাপ লেগেছে খুব। তবুও মেনে নিয়েছি। ভালোবাসার জন্য কাউকে তো আর জোর করা যায় না! তাই না?

পরের দিন আবার তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে- আমি কল্পনায়ও ভাবিনি। অথচ দেখা হয়ে গেল! খুব অদ্ভুত আমাদের জীবন, তাই না! অনেক সাধ্য সাধনা করেও তোমার দেখা পাওয়া যায় না। আবার দেখ কখনো কখনো খুব অনায়াসে কেমন দেখা হয়ে যায়। জানো রাই, সেদিন তোমাকে একান্তে পেয়ে খুব নার্ভাস লাগছিল। চারপাশে এতো এতো মানুষ। তবুও খুব নির্জন লাগছিল। তোমার সঙ্গে পাশাপাশি হেঁটে চলা, আড়চোখে তোমাকে দেখা- সব মিলে এক অন্যরকম ভালো লাগা। হেঁটে হেঁটে গিয়ে আমরা দাঁড়ালাম এক জায়গায়। এদিকটায় মানুষের ভিড় কিছুটা কম। আবার ভিড় কম বলেই তোমার শঙ্কা। কেউ যদি দেখে ফেলে?

আমি তোমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিলাম। কী নিষ্পাপ মায়াময় মুখ তোমার। শান্ত গভীর চোখ। ইচ্ছে করে সারাজীবন চেয়ে থাকি। মনে আছে এভাবে আমার তাকানোকে একদিন ঘাতক চাউনি বলেছিলে? জানো, আমি কেন এতো গভীর আবেশে তোমার চোখের দিকে, মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি? আমি তোমার চোখের ভাষা পড়তে চাই। মুখের প্রতিটি রেখা পড়তে চাই। বুঝতে চাই, জানতে চাই তোমার মনের কোথাও আমার জন্য একটুখানি অনুভব আছে কি নেই!

হঠাৎ খুব শান্ত গলায় তুমি বললে, ‘পেছনে তাকাও।’ আগেই দেখেছিলাম মাথার উপর পূর্ণ পূর্ণিমার চাঁদ। লেকের জলে চাঁদের বিশাল ছায়া এবং সোডিয়াম লাইট ছপিয়েও কেমন ফিনিক ছোট্টা জোছনা উঠেছে। কিন্তু আমার তো তখন তোমাকে দেখার সাধ। তোমাতে বিলীন হওয়ার ইচ্ছে। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও পতঙ্গ যেমন আগুনে ঝাঁপ দেয়, আমিও তেমন স্বেচ্ছামৃত্যু খুঁজছি তোমার চোখে।

সেদিনের সদ্য বিকেল পেরোনো সন্ধ্যায় আকাশের রং তখনো ছিল ঘন নীল। আর আকাশে ভাসছিল অসংখ্য সাদা মেঘ। মানুষ ভাবে আকাশ আর মেঘ পরস্পরকে ছুঁয়ে থাকে। কিন্তু আদতে কি তাই? মেঘ আর আকাশ পাশাপাশি থাকে। পাশাপাশি ওড়ে। অথচ তাদের মাঝে যোজন যোজন দূর। ভাসতে ভাসতে সাদা মেঘ একসময় কালো হয়ে যায়। তারপর বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে। আকাশ তখন নিস্তরূ নিশ্চল কর্তব্যহীন হয়ে থাকে। আকাশের কি খুব কষ্ট হয় মেঘের ঝরে পড়ায়? কে জানে! হয়তো হয়। হয়তো হয় না। তবে আমার কি মনে হয় জানো, আকাশ হয়তো মনে মনে মেঘের জন্য অপেক্ষা করে। বৃষ্টির পর রোদ হয়ে ওঠে। সূর্যের আলোয় ঝলমলিয়ে ওঠে আকাশ। সাদা মেঘের জন্য অপেক্ষা করে। এক সময় মেঘেরা আসে। পাশাপাশি হাঁটে। তুলোর মতো ভাসে। আকাশ আবার আশায় বুক বাঁধে- এবার হয়তো মেঘের ছোঁয়ায় পুলকিত হবে তার জীবন।

কিন্তু আবারও সেই ঝরে পড়ার নিয়তি। বৃষ্টি হয়ে মেঘ মিশে যায়, গাছের পাতায়, নদীর জলে, ফসলের খেতে, বাতাসে বাতাসে! আকাশের অপেক্ষা আর ফুরোয় না! সেই সন্ধ্যার আকাশটার কথা মনে পড়ছে খুব।

সেই সন্ধ্যায় আমার কী মনে হয়েছিল জানো? তুমি আমার প্রেমে পড়েছো। না হলে তো একথা বলতে না। ওই যে আচমকা তুমি বললে, ‘প্রেম করেই ছাড়বে? আমি তো চাই না প্রেম করতে!’

বলেছিলাম— প্রেম তো করা যায় না। হয়ে যায়।

শুন তুমি কি একটু হেসেছিলে? ঠিক মনে পড়ছে না এতোদিন পর! তবে এটা মনে আছে এরপর তুমি চলে যাওয়ার জন্য খুব তাড়া দেখাচ্ছিলে। কেন এমনটা করছিলে তার কিছুটা হয়তো বুঝি। বুঝি না অনেকটাই।

সেই সন্ধ্যার পর কতো করে খুঁজেছি তোমায়। কতো শীতের রাতে ভীষণ রকম কুয়াশা নেমেছে। শীতের তীব্রতায় রাস্তাঘাট সব দ্রুত খালি হয়ে গেছে। আর আমার অনেক বেশি ইচ্ছে করেছে, রাস্তার ধারের কোনো দোকানে দাঁড়িয়ে মাটির ভাঁড়ে তোমার সঙ্গে এক কাপ চা খাই। শীতের রাতে তোমার সঙ্গে হাত জড়াজড়ি করে হাঁটি। অথবা এমন কতো দিন হয়েছে তীব্র জোছনায় ভেসে গেছে শহর। সোডিয়াম আলো ছাপিয়ে চাঁদের আলো জ্বলে উঠেছে অনেক উজ্জ্বল হয়ে। আকাশে বসেছে লক্ষ তারার মেলা। আমার মনে হয়েছে তুমি যদি পাশে থাকতে! যদি তোমার সঙ্গে পাশাপাশি হাঁটতে পারতাম?

রাই, এই শহরে ইটের জঞ্জালের ভিড়েও দুয়েকটি জায়গা আছে এখনো সজীব নির্মল। একদিন শহরের পথে হাঁটতে গিয়ে দেখি অসংখ্য বকুল ফুল ছড়িয়ে আছে। প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো কারো কাছ থেকে রাস্তায় পড়ে গেছে ফুলগুলো। কিন্তু মাথা তুলে ওপরে তাকাতেই দেখি একটা লম্বা ঢাঙা বকুল গাছ। বকুল গাছ সাধারণত খুব ঝাঁকড়া হয়। কিন্তু এই গাছের পাতাগুলো অনেক পাতলা। কিন্তু অসংখ্য ফুল তার শরীর জুড়ে। সেই বকুল ছড়ানো পথে হাঁটতে গিয়ে তোমার কথা খুব মনে পড়ছিল। তোমাকে অনেক করে খুঁজেছি! কতো দিন ডেকেছি তোমাকে। কিন্তু তুমি আসোনি। কেন আসোনি? জিজ্ঞেস করবো আজ? না থাক জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। সব কথার উত্তর কি জানতে হবে? জেনে কী লাভ? কিছু কথা অজানা থাকা ভালো। অথবা জানলেও না বোঝা ভালো। সব বুঝতে গেলে বিপদ বাড়ে। কষ্ট বাড়ে। আক্ষেপ বাড়ে। এমনতেই অনন্ত আক্ষেপের সমষ্টি আমাদের জীবন।